চা শ্রমিকের অধিকার ও মালিকের অঙ্গীকার

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

এশিয়া ফাউন্ডেশন

SEHD
Society for Environment and Human Development

The Asia Foundation

পানির পরে বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয় 'চা'। চা শিল্পের মূল চালিকাশক্তি হলো চা শ্রমিক। এই শ্রমিকদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলেই পাওয়া যায় এই সুস্বাদু পানীয়। বাংলাদেশে সিলেটের সুরমা ভ্যালিতে ১৮৫৪ সালে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চায়ের চাষ শুরু হয়। বর্তমানে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি পার্বত্য জেলার ১৬০টি চা বাগানে কাজ করছে ১ লক্ষ ২২ হাজারের অধিক শ্রমিক। এসব শ্রমিকের পূর্ব পুরুষদের ব্রিটিশ কোম্পানি অবিভক্ত ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য এলাকা থেকে তৎকালীন আসাম অঞ্চলের চা বাগানে কাজের জন্য নিয়ে আসে। তারা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। হতদরিদ্র এসব মানুষ ভালোভাবে বাঁচার আশায় চা বাগানে কাজের সন্ধানে আসেন। কিন্তু তাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অথবা জোরপূর্বক নিয়ে আসার পর থেকে চা বাগানে বাঁধা শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। প্রায় দেড়শো বছর পার হয়ে গেলেও চা শ্রমিকরা নানা বঞ্চনার শিকার। শ্রমিক-মালিক উদ্যোগে গত কয়েক বছরে চা শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেলেও তা এখনো জীবনযাত্রার সঠিক মান অনুপাতে পর্যাপ্ত নয়। পাশাপাশি চার প্রজন্ম পার করে এসব মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক হলেও চা বাগানের বাইরে অপরিচিত। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি এমনকি অন্যান্য আদিবাসীসহ অনেক বঞ্চিত জনগোষ্ঠী থেকেও এরা বিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন সময় সরকার এবং মালিক পক্ষ থেকে নানা প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও বেশিরভাগ প্রতিশ্রুতিই আলোর মুখ দেখেনি। বিভিন্ন সময় মালিকদের সাথে কথা বলে জানা যায় দ্রুত পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাব, চায়ের আমদানি, রপ্তানি হ্রাস এবং নানা রকম বিনিয়োগ প্রতিকূলতার কারণে সকল স্তরে চা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যার শিকার প্রত্যক্ষভাবে দরিদ্র শ্রমিকরাও। তাই পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন বিশেষ মনোযোগ ও কর্মসূচি।

চা শ্রমিকদের চিহ্নিত সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের মধ্যে ৮০টির অধিক জাতিগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে সাম্প্রতিক গবেষণায়। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ ধারায় দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকারের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' একইভাবে ২৮ ধারায় বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য করবে না।' কিন্তু বাংলাদেশের চা শ্রমিকেরা সংবিধান প্রদত্ত এই সকল অধিকার অজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সরকার ও মালিকের সুদৃষ্টির অভাব ইত্যাদি কারণে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে না। বিভিন্ন সময় চা জনগোষ্ঠীর মানুষদের উপর গবেষণায় যে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো আলোচনা করলেই তাদের প্রতি বৈষম্যর চিত্র পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

- **বাসস্থান:** চা শ্রমিকদের পরিবার প্রতি বরাদ্দ লেবার লাইনে ১২ x ১৮ ফুট-এর কাঁচা অথবা আধাপাকা ঘর। ইট বা মাটির দেয়াল ও টিন বা এসবেসটস-এর ছাউনির অস্বাস্থ্যকর ঘরগুলোকে প্রায়ই শ্রমিকদের নিজেদের মেরামত করে নিতে হয়। যদিও এগুলো কোম্পানীর মেরামত করে দেয়ার কথা। এ রকম একটি ছোট ঘরে শ্রমিক পরিবারের আট থেকে দশ জন সদস্যকে বসবাস করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবারের গবাদি পশুগুলোও একই ঘরে রাত্রিযাপন করে। আবার এসবেসটসের ঘরগুলোতে দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে শ্রমিকদের শরীরে ক্যান্সারের ঝুঁকি তৈরি হয়।

- **মজুরি:** একজন চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি মাত্র ৮৫ টাকা যা ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল মাত্র ৬৯ টাকা। ২০০৯ সালেও এদের মজুরি ছিল ৩২.৫০ টাকা। এই নিম্ন মজুরি তাদের জীবনে সমস্যার অন্যতম কারণ। চা বাগানের বাইরে তাদের কাজের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে শ্রমিক প্রতি রেশনের ব্যবস্থা আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। একজন শ্রমিক প্রতি সপ্তাহে রেশনে কেজি প্রতি দুই টাকা দরে ৩.২৭ কেজি চাল অথবা আটা পান। ওই শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল দুজন শিশু যাদের বয়স ১-৮ বছর তারা ১.১১ কেজি এবং ৮-১২ বছরের শিশু সপ্তাহে ২.২২ কেজি রেশন পায়। তবে কোনো শ্রমিক যদি চা বাগানের অভ্যন্তরে খেতল্যান্ড চাষ করেন তবে তিনি রেশন থেকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে বঞ্চিত হন।

- **শিক্ষা:** সরকারিভাবে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকলেও চা বাগানের চিত্র ভিন্ন। পঞ্চগড় বাদে দেশের ১৬০টি চা বাগানের হাতেগোনা কয়েকটিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বাগান মালিকদের পরিচালিত কিছু স্কুল আছে। তবে এসব স্কুলেরও প্রভূত উন্নয়ন প্রয়োজন। চা-বাগানের স্কুলগুলোর অবকাঠামো এবং শিক্ষার

গুণগতমান সন্তোষজনক নয়। মানসম্মত শিক্ষকেরও সংকট রয়েছে। চা বাগানগুলোতে হাইস্কুল খুবই কম এবং হাতেগোনা কয়েকটি সরকারি স্কুল আছে। তবে চা বাগানগুলোতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও মিশনারি পরিচালিত হাজার খানেক স্কুল আছে। এসব স্কুল শিক্ষা লাভে আগ্রহী চা শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য খানিকটা স্বস্তি এনেছে।

- **কোটা:** বাংলাদেশের অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা থাকা সত্ত্বেও চা জনগোষ্ঠী এবং তাদের সন্তানরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। চা শ্রমিক হিসেবে পরিচিতির কারণে চা বাগানের বাইরে সরকারি-বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তারা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন।

- **স্বাস্থ্য সেবা:** ২০১৫ সালে বাংলাদেশ চা বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রামের চা বাগানগুলোতে ৬৭টি হাসপাতাল, ১৪৭টি ডিসপেন্সারি এবং ২৭৮টি দিবা যত্ন কেন্দ্র আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকেরা যথাযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। এসব ডিসপেন্সারি ও হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংকট ব্যাপক। কখনও কোনো বিশেষ স্বাস্থ্য সেবার জন্য যদি কোনো শ্রমিক বা তার পরিবারের সদস্যদের বাগানের বাইরে কোনো হাসপাতালে নিতে হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে বাগান মালিকদের কাছ থেকে অ্যাম্বুলেন্স বা আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায় না। এমনকি এমনও অভিযোগ পাওয়া যায় যে কখনো কখনো বাগানের বাইরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অনুমতিটুকুও বাগান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মেলে না।

- **মাতৃত্বকালীন ছুটি:** চা বাগানের পাত্তিওয়ালীদের (চা পাতা তোলার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক) প্রায় ৯০ শতাংশই নারী। অথচ নারী ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এখানে উপেক্ষিত। যেহেতু চা বাগান সমাজের মূলস্রোত থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, তাই সরকারিভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারণাও এখানে কম। ফলে অধিকাংশ নারীই অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। কিন্তু আইন অনুযায়ী বাধ্যবাধকতা না থাকায় তৃতীয় বা পরবর্তী সন্তানের জন্মের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন ছুটি না পাওয়ায় প্রসবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভারী বোঝা কাঁধে নিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। যার ফলে মা ও শিশু উভয়কেই মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়।

- **কীটনাশক ব্যবহার:** চা বাগানে যারা আগাছা পরিষ্কার ও কীটনাশক ছিটানোর কাজে নিয়োজিত তারাও মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে থাকেন। কারণ তাদের বেশিরভাগকেই এ কাজের জন্য কোনো বিশেষ পোশাক বা এ্যাপ্রোন, মাস্ক এবং জুতা দেয়া হয় না। ফলে কীটনাশকের বিষ সবসময় নিশ্বাসের সাথে তাদের শরীরে প্রবেশ করে। এ কাজে নিয়োজিত বেশিরভাগ শ্রমিকই বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্টজনিত অসুখে আক্রান্ত হন।

- **স্যানিটেশন:** বাংলাদেশে অন্যান্য জায়গায় স্যানিটেশন কর্মসূচি বড় সাফল্য অর্জন করলেও চা শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেক এখনও খোলা জায়গায় মলত্যাগ করতে বাধ্য হন। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ চা বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী চা বাগানগুলোতে ৬,৯৫০টি হ্যান্ডটিউবওয়েল, ৭,০০১টি কূপ এবং ২৭৯টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। তবে শ্রমিকদের বক্তব্য অনুযায়ী প্রয়োজনের তুলনায় এগুলো অত্যন্ত অপ্রতুল। যে কারণে তারা প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিরাপদ পানি পান করতে পারেন না।

- **কর্মঘণ্টা:** চা-বাগানে নারী শ্রমিকদের কখনো কখনো ১২ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। নির্ধারিত পরিমাণ (নিরিখ) চা-পাতা তোলার পরও বাড়তি আয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় চা-পাতা তোলার কাজ করতে তারা বাধ্য হন। এরপর তাদের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, সন্তান লালন-পালন ও রান্না-বান্নাসহ গৃহস্থালীর নানাবিধ কাজকর্ম করতে হয়।

- **ভূমি অধিকার:** বাংলাদেশের চা শ্রমিকরা সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন। যে বন কেটে তারা চা বাগানের উপযুক্ত জমি তৈরি করেছেন সেই বাগানের লেবার লাইনের নির্দিষ্ট জমিতে তারা বাস করেন, কেউ কেউ বাগানের খেতল্যান্ডে ফসল ফলান। অথচ জমির উপর তাদের কোনো মালিকানা নেই। ১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে এদেশে বসবাসরত এই জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্র কিংবা বাগান মালিকরা জমির মালিক হবার সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এমনকি যেকোনো সময় বাগান মালিক শ্রমিকের কাছ থেকে খেতল্যান্ড নিয়ে নিতে পারে। সরকারও যেকোনো সময় তার প্রয়োজনে খেতল্যান্ডের দিকে হাত বাড়াতে পারে। সম্প্রতি এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাটের চাঁন্দপুর চা বাগানে। চা বাগানের কৃষিজমি ব্যবহারকারী শ্রমিক অথবা বাগান মালিকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা না করেই সরকারের তরফ থেকে 'বিশেষ-অর্থনৈতিক অঞ্চল' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে শ্রমিকদের সাথে আলাপ-আলোচনায় রাজী নন। খেতল্যান্ডের ফসল

এই নিম্ন মজুরির শ্রমিকদের জীবনে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ ১৫০ বছর ধরে চাষ করা জমি কীভাবে চা শ্রমিকরা ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনায় সরকারের কোনো আগ্রহ নেই।

সারণি ১: চা চাষের জন্য অঞ্চলভিত্তিক ভূমি এবং উৎপাদন (২০১৪)

জেলা	চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাকৃত জমি (হেক্টর)	চা চাষের এলাকা (হেক্টর)	চা চাষের জন্য ব্যবহৃত ভূমি (%)	উৎপাদন (কেজি)	উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)
মৌলভীবাজার	৯২	৬৪,০৮২.১১	৩৩,৬৮১.৯২	৫২.৫৬	৩৬,৮৩৫,৫১৯	১,২৫২
হবিগঞ্জ	২৪	২২,০৩৩.৪৮	১২,৪৯৭.৬২	৫৬.৭২	১৩,৬৯০,৭৭৭	১,২৫৭
সিলেট	২০	১১,৮৪৯.১০	৫,৩১৬.১৪	৪৪.৮৭	৫,২৩৫,৬৫৮	১,১০২
চট্টগ্রাম	২২	১৫,৩২৯.৬৩	৬,৪৪১.৪২	৪২.০২	৬,৬১৩,৪৮৮	১,২৬১
রাঙ্গামাটি	১	৩০৭.০০	১৫৮.৫০	৫১.৬৩	৪০,৫০০,০০	২৬৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১	৬২.৫৫	০০	০০	০০	০০
মোট	**১৬০**	**১১৩,৬৬৩.৮৭**	**৫৮,০৯৫.৬০**	**৫১.১১**	**৬২,৪১৫,৯৪২**	**১,২৩৯**

সূত্র: বাংলাদেশ টি বোর্ড (বিটিবি)। স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রি-২০১৫।

সারণি ২: বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রামে চা-বাগানের জন্য বরাদ্দকৃত কৃষি ও অকৃষি জমি

ব্যবহৃত জমির ধরন	ব্যবহৃত জমি (হেক্টর)	% মোট জমির অংশ
কৃষিকাজে ব্যবহৃত		
রাবার	৯,৩৭৮.২১	৮
রোপিত বন	২,৪৭৮.৪০	২
প্রাকৃতিক বন	৭,৬৮০.৬৮	৭
বাঁশবাগান	৩,২৬১.৭৫	৩
শনঘাস	২,০০৫.৩৩	২
ধানচাষের জমি	১২,১৩৪.২৯	১১
অন্যান্য অর্থকরী ফসলের জমি	১,০৬৮.১০	১
অকৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি (হেক্টর)		
পতিত/নিষ্ফলা/অব্যবহৃত জমি	৩,৩৫৯.৮০	৩
ঝরনা/পুকুর/জলাশয়	৩,২০০.৬০	৩
ঘরবাড়ি/অবকাঠামো	৯,৩১৫.০৪	৮
অন্যান্য ব্যবহার	৫৬৪.৭০	০.৫
চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত জমি	৭,১৪২.৬৮ হেক্টর	

সূত্র: বাংলাদেশ টি বোর্ড (বিটিবি)। স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রি-২০১৫

- **যাতায়াত ব্যবস্থা:** বাগানের বাইরে বাঙালি প্রতিবেশীদের সাথে তো বটেই বাগানের ভিতরেও শ্রমিকদের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নাজুক। লেবার লাইন থেকে সেকশন, যেখানে শ্রমিকদের কাজের জন্য প্রতিদিন হেঁটে যেতে হয় সেটি বেশ দূর। এক থেকে দুই ঘণ্টা হেঁটে তবেই কাজের জায়গায় পৌঁছানো যায়। বর্ষার দিনে এইসব মাটির রাস্তায় চলাচল ভীষণ কষ্টসাধ্য। লেবার লাইন থেকে শহরের দূরত্বের কারণেও তারা বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হন।

- **শ্রমিক কল্যাণ তহবিল:** শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থের পরিমাণ এতোই কম যে তা থেকে চা শ্রমিকরা বিশেষ কোনো উপকার পান না।

- **কর্ম পরিবেশ:** চা শ্রমিকদের পাতা বোঝাই ভারী ঝুড়ি মাথায় নিয়ে দুই থেকে তিন কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পাতা সংগ্রহের স্টেশনের কাছে যেতে হয়। অনেক ওজন মাপার যন্ত্রের কাছে কোনো ছাউনি নেই। পাতা মাপার জন্য ঝড়-বৃষ্টি কিংবা প্রচণ্ড রোদে খোলা আকাশের নিচে তাদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

- **খাবার পানি:** কাজের ফাঁকে পান করার মতো পর্যাপ্ত পানি শ্রমিকরা সবসময় পান না। আবার বাগানের পানিওয়ালারা শ্রমিকদের পানের জন্য কীটনাশক রাখার খালি পাত্রে করে খাওয়ার পানি বহন করেন যা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

- **সাপ ও পোকামাকড়ের কামড়:** চা বাগানে সাপ, জোঁকসহ বিভিন্ন বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় নিত্যদিনের ঘটনা। এ থেকে নানা ধরনের রোগ সংক্রমণও হয়।

- **বেকারত্ব:** বেকারত্ব চা বাগানের শ্রমিক এবং চা জনগোষ্ঠীর একটি প্রধান সমস্যা। বাগানের সাধারণ নিয়মে একটি পরিবারের একজনই চা-বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পারে। বাগানগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কাজের সুযোগ সীমিত যে কারণে বহুলোক কর্মহীন জীবনযাপনে বাধ্য হয়। আবার শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাজে নিয়োগের সুযোগও খুব কম। চা শ্রমিক হিসেবে পরিচিতির কারণে বাগানের বাইরে অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রেও তারা বিড়ম্বনার শিকার হন।

চা-শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

চা শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন হওয়া সত্ত্বেও এর নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা রয়েছে। সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ:

- **গণতন্ত্রের অভাব:** ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন দেশের সর্ববৃহৎ শ্রমিক ইউনিয়ন। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিসিএসইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে। এর আগে চা কোম্পানিগুলো তাদের পছন্দমতো লোকজন দিয়ে কমিটি গঠন করে দিত এবং ইউনিয়নের উপর নিজ প্রভাব বজায় রাখত। ফলে এসব কমিটি কখনও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করেনি এবং ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। ২০০৮ সালে গঠিত কমিটি দু'বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হলেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে মাত্র এক বছর টিকে ছিল। এরপর দ্বিতীয়বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালের ১০ আগস্ট। এতে পূর্বের প্যানেলের নেতৃত্বই নির্বাচিত হয়ে আসে। নির্বাচনে প্রায় ৯৫ হাজার শ্রমিক ভোট দেয়। চা শ্রমিকদের দাবি কেন্দ্রীয়, ভ্যালি ও পঞ্চায়েত পর্যায়ের নির্বাচিত কমিটিগুলো যেন তাদের পুরো মেয়াদকাল অর্থাৎ পরবর্তী তিন বছরের জন্য টিকে থাকে এবং বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক চর্চা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকে।

- **কাঠামোগত সমস্যা:** বিসিএসইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি কৌশলগতভাবে এখনও ততোটা সবল নয়। এই কমিটির কিছু সীমাবদ্ধতা ও অপর্যাপ্ততার মধ্যে ইউনিয়ন অফিসে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও প্রিন্টারের অভাব উল্লেখযোগ্য। এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মতো দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মীরও অভাব রয়েছে। কমিটির অর্থনৈতিক

(উপর) কাচাপাতা মাথায় ওজনের অপেক্ষায় পাত্তিয়ালিরা। (নীচ) ডিসেম্বর ১৪, ২০১৫ তারিখে ঢাকায় ইনসেপসন সেমিনার।

Tea Growing Areas of Bangladesh

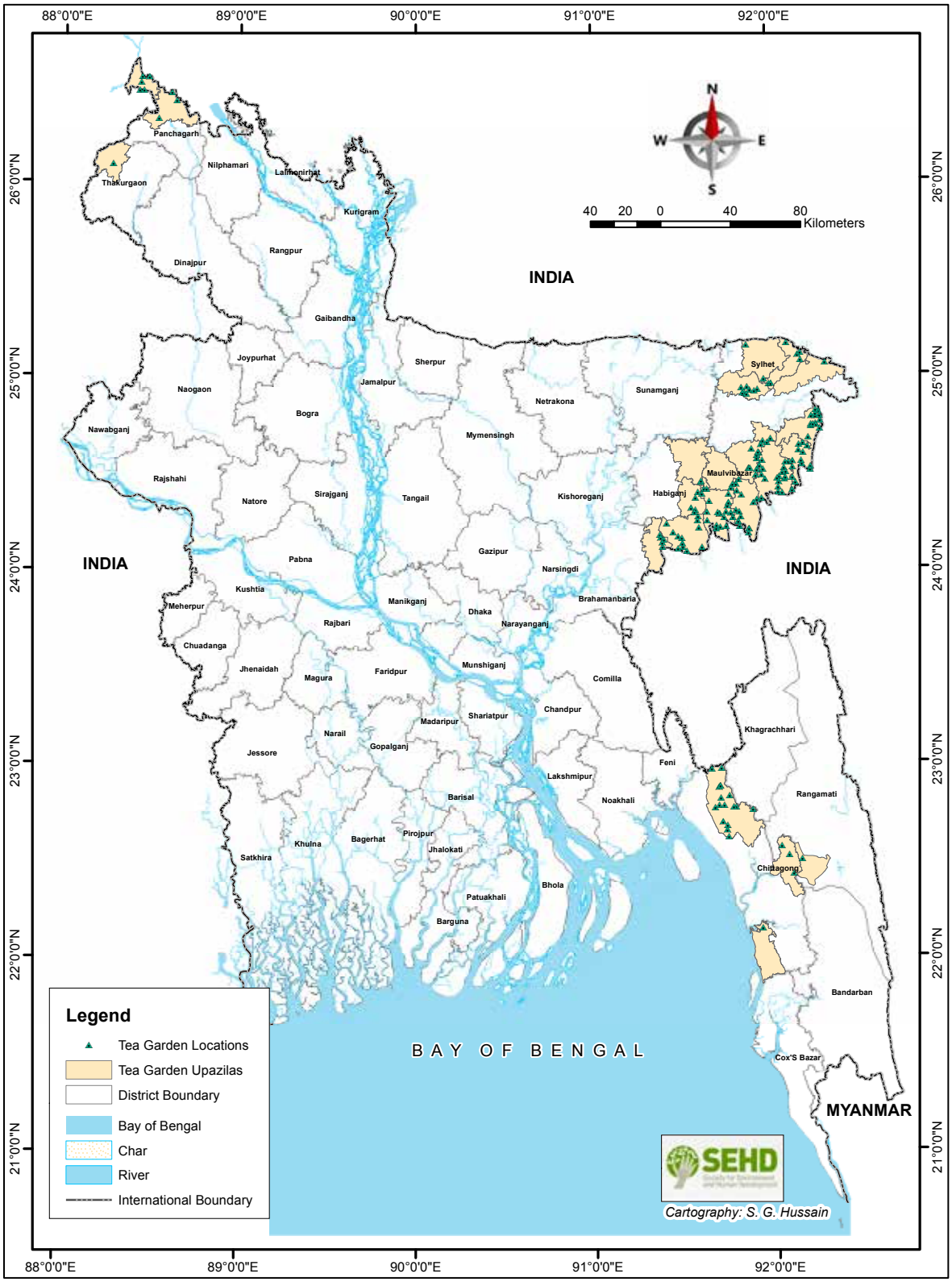

ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের পারদর্শিতা নেই। দেশের সবচেয়ে বড় ট্রেড ইউনিয়ন হওয়া সত্ত্বেও এর কোনো গবেষণা সেল ও গণযোগাযোগ শাখা নেই। ইউনিয়নের কোনে প্রকাশনা নেই। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তৈরি ও সংবাদমাধ্যমের সাথে যোগাযোগের জন্য কমিটিতে দক্ষ লোকবলের অভাব রয়েছে।

- **তথ্য প্রযুক্তিগত দুর্বলতা:** বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও কার্যক্রমসহ নানা বিষয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সংগঠনের নিজস্ব ওয়েবসাইট। কিন্তু বিসিএসইউ-এর কোনো অফিসিয়াল ওয়েবসাইট নেই।

- **প্রকাশনার অনুপস্থিতি:** বিসিএসইউ-এর কোন প্রকাশনা, নিউজ বুলেটিন অথবা নিউজলেটার নেই। যে কারণে শ্রমিকদের খবর, তাদের প্রাত্যহিক সমস্যা, চাহিদা অথবা দাবিসমূহ সরকার বা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না।

- **নেতৃত্বের বিভেদ:** বিসিএসইউ-এর নেতৃত্বের মধ্যে ঐকমত্যের ঘাটতি বিরাজমান যে কারণে তারা নানা বিষয়ে দরকষাকষিতে পিছিয়ে থাকেন। এর পাশাপাশি বাগানে বসবাসরত প্রায় ৮০টির অধিক জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত বিভেদও তাদের ঐক্য গঠনের বিশেষ চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

- **অধিকার সম্পর্কে ধারণার অভাব:** বিসিএসইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি, ভ্যালি কমিটি ও পঞ্চায়েত কমিটির সদস্যদের মধ্যে আইএলও কনভেনশন, বাংলাদেশের শ্রমআইন এবং শ্রমিক অধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে।

- **আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** বিসিএসইউ-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষতার অভাব রয়েছে। সাধারণ চা-শ্রমিকদের চাঁদার টাকায় কমিটির কার্যক্রম চলে। কমিটির বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রমিকদের কাছ থেকে মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করা হয় এবং দুই থেকে তিন মাস পরপর চেকের মাধ্যমে বিসিএসইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট পাঠানো হয়। এই পদ্ধতিকে "চেক অফ" (Cheque off) পদ্ধতি বলে। এই অর্থ পরে সেন্ট্রাল ও ভ্যালি কমিটির প্রয়োজনে ও শ্রমিকদের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। চা-শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই এই অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার হওয়া দরকার। কিন্তু এই অর্থের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, রেজিস্ট্রেশন, অডিট, ব্যাংকিং ও নগদ টাকা ব্যবস্থাপনা আরো দক্ষতার সাথে পরিচালনার দরকার আছে।

- **দরকষাকষির ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব:** মালিকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ চা সংসদ'-এর সাথে প্রয়োজনীয় দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রমিকদের মানসম্মত মজুরি, অধিকার ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ে বিসিএসইউ ততটা সুবিধাজনক অবস্থানে নেই যতট আছে মালিক পক্ষ। বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি), সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (যেমন- অকশন হাউজ, ডাইরেক্টরেট অব লেবার, লেবার কোর্ট) উপর প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিসিএসইউ-এর দক্ষতা প্রত্যাশিত পর্যায়ের চেয়ে অনেক কম।

চা শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার কৌশল এবং বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-কে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে করণীয়

- বাংলাদেশে ১ লক্ষ ২২ হাজার চা-শ্রমিকের মধ্যে অর্ধেকের মত নারী এবং পাত্তিওয়ালিদের ৯০ শতাংশই নারী। সুতরাং চা-বাগানে কাজের ক্ষেত্রে নারীদের দৈনন্দিন সমস্যা, কর্মক্ষেত্রের অবস্থা, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা, কর্মঘণ্টা, ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

- বিসিএসইউ-এর সকল পর্যায়ে যেমন, প্রশিক্ষণ, সভা-সমাবেশ এবং নেতৃত্বদানের প্রক্রিয়াতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে যাতে নারীরা তাদের নিজেদের সমস্যার কথা উপস্থাপন করতে পারেন।

- বিসিএসইউ নির্বাচন প্রক্রিয়াতে ২০০৮ ও ২০১৪ সালের মতো গোপন ব্যালটে ভোটের পদ্ধতি যেকোনো মূল্যে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।
- কেন্দ্রীয়, ভ্যালি ও পঞ্চায়েত কমিটি পর্যায়ের নেতৃত্বের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন যার মাধ্যমে তারা অফিস ব্যবস্থাপনা, অর্থ-ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ, ডকুমেন্টেশন (মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তৈরি), গণ-মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ, সরকার ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ করতে পারেন।
- বিসিএসইউ'র জন্য ব্রসিউর, ওয়েবসাইট, কম্পিউটার ও প্রিন্টার (কেন্দ্রীয় ও সাতটি ভ্যালি কমিটির জন্য) নিশ্চিত করা এবং ওয়েবসাইট পরিচালনা এবং অন্যান্য সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- বিসিএসইউ-এর নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ শ্রমিকদের আইএলও কনভেনশনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আইএলও কনভেনশনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশের সার-সংক্ষেপ বাংলায় অনুবাদ করে তাদের বোধগম্য করার ব্যবস্থা করা। অন্ততপক্ষে কমিটির নেতৃত্বকে এসব বিষয়ে পড়তে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবে প্রয়োগ করার কৌশল জানানো যাতে তারা তাদের অধিকারের স্বপক্ষের আইন-কানুনগুলো নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে।
- বিসিএসইউকে একটি গবেষণা ও যোগাযোগ সেল-এর কার্যক্রম শুরু করতে হবে যেন তারা সুনির্দিষ্টভাবে চা শ্রমিকদের ইস্যু সংশ্লিষ্ট তথ্য ও অন্যান্য খবর সংগ্রহ করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো নিউজলেটার, বুলেটিন, ফ্লাইয়ার, পোস্টার, রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারে। এসব বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিসিএসইউ-এর নেতৃত্বের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- চা-শ্রমিকদের ন্যায্য ও আইনগত দাবিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা।
- বিসিএসইউকে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মালিকদের এসোসিয়েশন-এর সাথে শ্রমিকদের দৈনন্দিন ইস্যু নিয়ে নিয়মিত সংলাপের আয়োজন করা যেখানে তারা (সরকার ও মালিক) শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- বিসিএসইউকে নিয়মিত বাগান মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে আলাদাভাবে বা যৌথভাবে সভা করতে হবে যেন তারা শ্রমিকদের কর্মস্থলের অবস্থা, মজুরি, কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত বা ফলাফল পাওয়া যাবে তা জনগণকে জানানোরও ব্যবস্থা করতে হবে।
- বর্তমান বাজারদর বিবেচনায় রেখে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২০০ টাকা করা প্রয়োজন।

লেখা ও ছবি: ফিলিপ গাইন। বাংলা অনুবাদ: সৈয়দা আমিরুন নূজহাত ও মোঃ হামিদুল হক।

চা শিল্পের উন্নয়নে সরকারি পদক্ষেপ

২০১৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর ইনসেপশন সেমিনারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মি. শওকত আলী ওয়ারসি চা শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার কথা বলেন। তিনি বলেন, সরকার একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছে এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নিলফামারীসহ উত্তরাঞ্চলের আরও কিছু এলাকায় ছোট ছোট চা বাগান তৈরিতে সহায়তা দিচ্ছে যাতে এ শিল্পে উৎপাদন বাড়ে এবং বেশি পরিমাণ জনশক্তি কাজ করার সুযোগ পায়। তিনি বলেন, সরকার "স্মল হোল্ডিং টি প্লান্টেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ" এবং "স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভিশন ইন চিটাগং হিল ট্রাক্টস" শিরোনামে দুইটি প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে। সরকার ২০২৫ সাল নাগাদ বছরে ১০০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে এবং খুব বিবেচনা সাপেক্ষে যতটুকু পরিমাণ চা আমদানী না করলে নয় ততটুকু আমদানীর অনুমতি দিচ্ছে। মি. ওয়ারসি জানান, সরকার খুশি হবে যদি বাগান মালিকরা চা উৎপাদনে তাদের চ্যালেঞ্জগুলো লিখিতভাবে সরকারকে জানায় এবং সেক্ষেত্রে সরকার অবশ্যই মালিকদের সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করবে।

চা শিল্প প্রসঙ্গে মালিক সমিতির মতামত

ইনসেপশন সেমিনারে মালিক পক্ষের প্রতিনিধি তার মতামত তুলে ধরেন। চা চাষ এখন আর লাভজনক নয়। বিগত পুরো দশক জুড়ে চা আমদানী, ব্যাংক ঋণের অপ্রতুলতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও চা চাষের ক্ষেত্রে আরো নানা সমস্যা বিরাজমান। শ্রমিক কল্যাণে ব্যবহৃত সুযোগ-সুবিধার উপকরণাদি দিন দিন ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে। চা কৃষিভিত্তিক শিল্প হওয়ার পরেও ব্যাংক ঋণের সুদের হার ১৩ টাকা। সরকার কম সুদে ব্যাংক ঋণ সরবরাহ না করায় নতুন বাগান সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন বাগান থেকে চা সংগ্রহ করতে পাঁচ বছর সময় লাগে। এতে চায়ের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। চা চাষে অনাগ্রহ থাকার পরেও মালিকরা চা শিল্পের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন এবং শ্রমিক কল্যাণে ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

চা বাগানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও তার মান উন্নয়ন জরুরি। চা বাগানে এসএসসি পর্যন্ত পড়াশুনার জন্য একটি আবাসিক স্কুল আছে। বিটিএ ভাল ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে সরকার অথবা বেসারকারি সংস্থার এগিয়ে আসা অত্যাবশ্যক। শ্রম আইন অনুসারে অসুস্থতাজনিত ছুটি বছরে ১৪ দিন হলেও চা বাগানে শ্রমিকরা অসুস্থতাজনিত ছুটি পায় ২০ দিন। দেশব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির সাথে পাল্লা দিয়ে বিটিএ কখনোই শ্রমিকদের রেশনের মূল্য বৃদ্ধি করেনি। বিটিএ প্রত্যেক চা শ্রমিকের জন্য ৩৪০ বর্গফুট আয়তনের বসতঘরের ব্যবস্থা করছে। বাংলাদেশীয় চা সংসদ চা শ্রমিকদেরকে চা শিল্পের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও আবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে মালিক শ্রমিক পরিবারের তত্ত্বাবধান করে।

প্রতি দুই বছর পর বাংলাদেশ চা সংসদ বিসিএসইউ-এর সাথে আলোচনায় বসে পরবর্তী দুই বছরের জন্য শ্রমিকের বেতন-ভাতা, বাসগৃহ, রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা চূড়ান্ত করে থাকে। প্রয়োজনের সময় বিটিএ বিসিএসইউ-কে সহযোগিতা করে; আবার চা বাগানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিসিএসইউ বিটিএ-কে সহযোগিতা করে।

মি. শাহ আলম চা শিল্পে শ্রমিকদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত একটি দেশে চা শ্রমিকরা শর্তহীনভাবে বেতন-ভাতার কোনো ধরনের চিন্তা ছাড়াই কাজ করেছেন। তারাই চা শিল্পের জীবন বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বাংলাদেশের চা শ্রমিক ইউনিয়ন

রেজি: নং- বাংলাদেশ-৭৭

রেজিস্টার্ড অফিস : লেবার হাউজ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

সার্কুলার

তারিখ: ফেব্রুয়ারি ৭, ২০১৬ খ্রি.

ভ্যালি কার্যকরী পরিষদ, বাগান পঞ্চায়েত ও চাঁদাদাতা সাধারণ চা শ্রমিকদের প্রতি

বাংলাদেশীয় চা-সংসদ (বিটিএ) ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক স্মারক চুক্তির সংক্ষিপ্ত সার।

১. এই দ্বি-পাক্ষিক স্মারক চুক্তি ০১.০১.২০১৫ খ্রি. হতে ৩১.১২.২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত বহাল থাকবে।

(ক) নতুন চুক্তির ফলে মাসিক বেতনধারী স্থায়ী শ্রমিকগণের মধ্যে ইলেকট্রিশিয়ান ও ড্রেসারগণের ৫৬.২৫ শতাংশ এবং সর্দার, মিস্ত্রি, লেদ অপারেটর, ধাই, পিয়ন ও ম্যাসেঞ্জারগণের ৫২.০৮ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। মাসিক বেতনধারী শ্রমিকগণের নতুন বেতন স্কেল নিম্নরূপ (সকল ক্লাস/ ক্যাটাগরির জন্য) ইলেকট্রিশিয়ান ড্রেসারগণের জন্য।

৩৭৫০-২৫ x ১০-৪০০০-৩৪ x ১০-৪৩৪০-৪৭ x ১০-৪৮১০

সর্দার, মিস্ত্রি, লেদ অপারেটর, ধাই, পিয়ন ও ম্যাসেঞ্জারগণের জন্য

৩৬৫০-২৪ x ১০-৩৮৯০-৩৩ x ১০-৪২২০-৪৬ x ১০-৪৬৮০

২. (খ) এই নতুন চুক্তির ফলে দৈনিক হাজিরাপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিকগণ নিম্নরূপ মজুরি পাবেন।

ক্রমিক নং	ক্লাস/ ক্যাটাগরি	দৈনিক মজুরি (টাকা)
০১	এ ক্লাস/ ক্যাটাগরি	৮৫.০০
০২	বি ক্লাস/ ক্যাটাগরি	৮৩.০০
০৩	সি ক্লাস/ ক্যাটাগরি	৮২.০০

(গ) স্থায়ী শ্রমিকগণ সাপ্তাহিক ছুটির দিনের মজুরি পাবেন।

(ঘ) সপ্তাহে দুই দিনের বেশি গরহাজির থাকলে ঐ সপ্তাহে সাপ্তাহিক ছুটির দিনের মজুরি প্রাপ্ত হবেন না।

(ঙ) এই নতুন চুক্তির ফলে অস্থায়ী বা ঠিকা শ্রমিকগণও স্থায়ী শ্রমিকদের মতো মজুরি পাবেন। স্থায়ী শ্রমিকদের মতো নিরিখ দিবেন।

৩. নতুন চুক্তির ফলে নিম্নলিখিত শ্রমিকগণ মজুরি/বেতনের সাথে, দৈনিক/মাসিক বেতনধারী শ্রমিকগণ নিম্নরূপ ভাতা পাবেন।

শ্রমিক	মোট ভাতা (টাকা)	শ্রমিক	মোট ভাতা (টাকা)
ইলেকট্রিশিয়ান	৭৫ টাকা (মাসিক)	ক্রেচ এটেনডেন্ট	৫৫ টাকা (দৈনিক)
মিস্ত্রি	৬৪ টাকা (মাসিক)	রোগী সাহায্যকারী	১২০ টাকা (দৈনিক)
সর্দার	৭৫ টাকা (মাসিক)	যোগালী সর্দার	২০ টাকা (দৈনিক)
লেদ অপারেটর	৭৫ টাকা (মাসিক)	কারখানা শ্রমিক	২ টাকা (দৈনিক)
ড্রেসার	৯৭ টাকা (মাসিক)	প্রশিক্ষণ ভাতা	১২৫ টাকা (দৈনিক)
ধাই	৭২ টাকা (মাসিক)	অবসর (পেনশন) ভাতা	
পিয়ন, ম্যাসেঞ্জার, চৌকিদার, মালি, ধোপা, সুইপার, পানিওয়ালা ও রাখাল	৬০ টাকা (মাসিক)	ক) দৈনিক হাজিরা প্রাপ্ত খ) মাসিক বেতনধারী	৬৫ টাকা (সপ্তাহে) ১০০ টাকা (সপ্তাহে)

৪. কীটনাশক ও আগাছানাশক ছিটানোর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের ঝুঁকি ভাতা দৈনিক ৪.০০ টাকা

৫. উৎসব বোনাস

সকল স্থায়ী শ্রমিকগণ প্রতি বছর ৩২ দিনের মজুরির সমপরিমান অর্থ বোনাস হিসেবে পাবেন। যার মধ্যে দূর্গাপূজা/ ঈদ-উল-আযহা ৬০ শতাংশ এবং লালপূজা (ফাগুয়া)/ ঈদ-উল-ফিতর ৪০ শতাংশ পাবেন। মাসিক বেতনধারী শ্রমিকগণ এক মাসের মজুরির সমপরিমাণ অর্থ বোনাস হিসেবে পাবেন।

৬. রেশনের মূল্য কেজি প্রতি ২.০০ টাকা হবে।

৭. রাবার টেপারগণ পরীক্ষামূলকভাবে একটি এপ্রোন পাবেন।

৮. শ্রমিকের তৈরি মাটির দেয়ালঘরে বাগান কর্তৃপক্ষ টিনের ছাউনি দিলে মাডওয়াল তৈরি বাবদ সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে ৫ হাজার টাকা দেয়া হবে।

৯. যেখানে বিদুৎ প্রাপ্তির সুযোগ আছে সেখানে বাগান কতৃপক্ষের খরচে শ্রমিকের ঘরে বিদুৎ সংযোগ দেয়া হয়। তবে বিদুৎ বিল সংশ্লিষ্ট শ্রমিক পরিশোধ করবেন।

১০. গ্র্যাচুইটি: বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬/২০১৩ মোতাবেক হবে।

১১. গ্রুপ বিমা: বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬/২০১৩ মোতাবেক চালু হবে।

১২. বকেয়া ০১.০১.২০১৫ খ্রি. হতে ৩০.০৯.২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত প্রকৃত কাজের দিনের ভিত্তিতে বকেয়া আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এবং ০১.১০.২০১৫ হতে ০৪.০২.২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত সাপ্তাহিক ছুটির দিনের মজুরিসহ বকেয়া আগামী ১ মাসের মধ্যে প্রদান করা হবে।

১৩. সিক লিভ: পূর্ণ মজুরিসহ বছরে ২০ দিন।

বি:দ্র : চুক্তিপত্র সংক্রান্ত এই সার্কুলার সংক্ষিপ্তরূপে বিতরণ করা হলো। চুক্তিপত্রের সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন অফিস/নিজ নিজ ভ্যালি অফিস/ইউনিয়ন কর্মকর্তা/কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সম্মানিত বাগান পঞ্চায়েতগণকে বিশেষভাবে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। সংগ্রামী সহকর্মী বাগান পঞ্চায়েতগণকে নিজ নিজ বাগানে সভা করে চাঁদাদাতা শ্রমিকদের এই সার্কুলারের বিষয় অবগত করানো এবং ইউনিয়নকে আরো শক্তিশালী করার জন্য ইউনিয়নের নির্ধারিত সকল ধরনের সদ্যস চাঁদা (যদি বকেয়া থাকে) হালনাগাদ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

রামভজন কৈরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন
মোবাইল: ০১৭১২-১৩০৮৯৮

যোগাযোগ
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১/১ পল্লবী (৬ষ্ঠ তলা), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮০-২-৯০২৬৬৩৬, ০১৭৯০১১০৫০১
ই-মেইল: sehd@sehd.org, ওয়েব: sehd.org